কমলেন্দু ভদ্র

পরিবর্তন?

বেশির ভাগ বুথফেরৎ সমীক্ষায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের একক ভাবে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু এই পূর্বাভাস কতটা ভরসাযোগ্য? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

গতকাল ছ'টি বড়ো বুথফেরৎ সমীক্ষার ফল বেরিয়েছে। তার মধ্যে একটির (টাইমস্ নাউ) ১২ মে-র পূর্বাভাস অনুযায়ী এন ডি এ জোট একক ভাবে সরকার গড়তে পারছে না। বাকি সব ক'টির ফল অনুযায়ী এন ডি এ একক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাচ্ছে। যদি এই বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলি সত্যি হয়, তা হলে ছ'টি সমীক্ষারই মূল প্রতিপাদ্য একটিই। তা হল বিজেপি-র বিপুল আসনে জয় লাভের সম্ভাবনা। উল্টো দিকে অনুমান করা হচ্ছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ, বাম, এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দল— কারওরই সরকার গড়ার কাছাকাছি যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

এখানে বুথফেরৎ সমীক্ষা সংক্রান্ত কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ভোট বিশেষজ্ঞ ডেভিড বাটলার-এর মতে ভারতের মতো একটি জনবহুল দেশে এবং এই দেশের বহু শ্রেণি, ভাষা, ধর্ম ও জাতির তারতম্যের জটিল পাটিগণিত এবং রসায়নের প্রেক্ষিতে বুথফেরৎ সমীক্ষার পূর্বাভাস অনেকটাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। মনে রাখা দরকার, ভারতের বুথফেরৎ সমীক্ষার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের বুথফেরৎ সমীক্ষার মডেলের অনুকরণ করা হয়েছে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির উপর ভিত্তি করে যে বুথফেরৎ সমীক্ষা হয়, সেটা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, কিন্তু ইংল্যান্ডে ও ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভা নির্বাচিত করেন। ১৯৯৮ সালে যখন ইংল্যান্ড-এর বুথফেরৎ সমীক্ষার মডেলটাকে অনুকরণ করার প্রথম চেষ্টা হয়, তখন কয়েকটা অসুবিধে সামনে আসে। এক, ইংল্যান্ডে বুথ-ভিত্তিক আর্থসামাজিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। অথচ, ভারতের আদমসুমারিতে কেবল জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু একটি জেলা আর একটি লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে কোনও রকম সামঞ্জস্য নেই, কারণ, একটি জেলায় এক বা একাধিক লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্র থাকতে পারে। আবার কখনও দুটো জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র মিলে একটি লোকসভা কেন্দ্র তৈরি হয়। দুই, ভারতে যাঁরা বুথফেরৎ সমীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ব্যক্তি, তাঁরাও মনে করেন যে প্রত্যেকটা লোকসভা কেন্দ্রে অন্তত চার হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার নিলে তবেই নির্বাচনের ফলাফল অনেকটা সঠিক আন্দাজ করা যেতে পারে। কিন্তু, তা হলে একুশ থেকে বাইশ লক্ষের মতো মানুষের সাক্ষাৎকার অল্প সময়ের মধ্যে নিতে হলে প্রচুর লোকবল এবং অর্থবল দরকার। সেটা আজও পর্যন্ত কোনও বুথফেরৎ সমীক্ষাই করে উঠতে পারেনি।

তা হলে ভারতের বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলি কী ভাবে করা হয়? যা করা হয়, সেটা হল অন্তত পঁচিশ হাজার লোকের সঙ্গে কথা বলে প্রত্যেকটা দলের শতকরা ভোটের ভাগের একটা আন্দাজ করা হয়। তার পর বুথফেরৎ সমীক্ষা থেকে ভোটের শতকরা ভাগের যে হিসেব পাওয়া গেল, সেটার উপর ভিত্তি করে আসন সংখ্যার অনুমান করা হয়। কিন্তু, সেইটা করা হয় একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস ও তার লোকসভা কেন্দ্রগুলোর আগের নির্বাচনের ফলাফলকে মাথায় রেখে। বলা যেতে পারে, এই ভোটের শতকরা হিসেবকে আসনসংখ্যায় রূপান্তরিত করাটাই যে কোনও বুথফেরৎ সমীক্ষার সব থেকে দুর্বল দিক। যেমন ধরুন, একটা দ্বিদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও একটি দল ২৫.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৭২টা আসন পেতে পারে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে। অথচ, আর একটি দল ৭৪.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে কেবল ২৭১টি আসন পেতে পারে। কারণ, প্রথম দলটি ওই ২৭২টি-র প্রতিটি আসনে ৫০.০১ শতাংশ ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে, আর দ্বিতীয় দলটি ২৭১টি আসনের প্রতিটিতে ১০০ শতাংশ ভোট পেয়ে জিততে পারে। যদিও এটা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু অঙ্কের হিসেবে তা সম্ভব। আমাদের মতো বহুদলীয় ব্যবস্থায় আরও অনেক জটিল ইস্যুগুলোর মাঝে রাজনীতির সব অঙ্কই ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে।

দেশের ছবি

১৯৯৮ সাল থেকে আমাদের দেশে লোকসভা নির্বাচনের যে বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলো হচ্ছে, তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলোকে বুথফেরৎ সমীক্ষায় যত আসন দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তারা তার থেকে কম সংখ্যক আসন পেয়েছে। উল্টো দিকে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেক কম আসন পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলো আন্দাজের থেকে বেশি আসন পেয়েছে। এই জন্য বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলোর সম্পর্কে অনেকে মজার সুরে বলেন যে, বুথফেরৎ সমীক্ষা হল 'ভারচুয়াল' আর নির্বাচনী ফলাফল হল 'একচুয়াল'। আবার আমাদের দেশে যাঁরা মানুষের বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষা চালান, তাঁদের অনেকেই সেই রাজ্যের ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। বুথফেরৎ সমীক্ষার এক বিশেষজ্ঞ টিভিতে নিজেই বলেছেন যে, কিছু মানুষ যদি তাঁদের সঠিক তথ্য না দেন, তা হলে সমীক্ষার ফলাফলে তার একটা প্রভাব পড়তে পারে। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি করে সম্ভব কারণ ১৬তম লোকসভা নির্বাচনকে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনে পরিণত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। গণমাধ্যমের একাংশও সেই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছে। মনে হয়েছে যেন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন হচ্ছে না, বরং মানুষের দ্বারা সরাসরি এক জন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হচ্ছেন। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ কখনওই পরাজিত পক্ষকে ভোট দিয়েছেন, সেটা প্রকাশ্যে বলার ঝুঁকি নেন না। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বহু সমীক্ষাই অতীতে মেলেনি। আবার কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনাও ঘটেছে। সেই ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলো আদৌ কাকতালীয় কি না, সেটা বলা কঠিন। জ্যোতিষশাস্ত্রে এবং গণৎকারদের প্রতি সাধারণ মানুষের যেমন প্রবল আগ্রহ, প্রায় সেই রকমই আগ্রহ এই সমীক্ষার ফলাফল জানার জন্য।

> যদি বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলোকে তাকে তুলে দিয়ে কেবলমাত্র ২০০৯-এর লোকসভা ও তার পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনগুলোর ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে বিজেপি-র আসন সংখ্যা অবশ্যই বাড়তে পারে, কিন্তু ফলে এনডিএ একক ভাবে সরকার গঠন করার মতো অবস্থায় থাকবে কি না, তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে।

আপাতত যদি বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলোকে তাকে তুলে দিয়ে কেবলমাত্র ২০০৯-এর লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যে তার পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনগুলোর হিসেবের ভিত্তি করে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে বিজেপি-র আসন সংখ্যা অবশ্যই বাড়তে পারে, কিন্তু ফলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ একক ভাবে সরকার গঠন করার মতো অবস্থায় থাকবে কি না, তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট খুব ভালো রকম জানে যে তারা পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে খুব কম আসন পাবে। এই সমস্ত রাজ্যগুলোতে ১৮৯টি আসন আছে। বলা যেতে পারে, ২৭২টি আসন পেতে গেলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩৫৪টি আসনের উপর সব থেকে বেশি নির্ভর করতে হবে। এটা যদিও খুব কঠিন কাজ, কিন্তু অঙ্কের হিসেবে তা সম্ভব। হতে পারে, এ রকমই একটি জটিল অঙ্ককে মাথায় রেখেই হয়তো একটি বুথফেরৎ সমীক্ষা এনডিএ জোটকে ৩৪০টি পর্যন্ত আসন দিয়েছে। এই বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলোতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বাড়বাড়ন্ত মূলত উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মতো বড়ো রাজ্যগুলোর সম্ভাব্য ফলাফলের ভিত্তিতে অঙ্ক কষা হয়েছে। এর মধ্যে গত ডিসেম্বর মাসের বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপি বড়ো জয় পেয়েছে। গুজরাটেও গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বেশ বড়ো জয় পেয়েছে। কিন্তু, বাকি প্রদেশগুলোতে বিজেপির এই সম্ভাব্য নির্বাচনী উত্থানের ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত। ধরুন, দুর্নীতি যদি এই নির্বাচনে বিজেপি একটি মূল ইস্যু করে, তা হলে কর্ণাটকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা-র বিরুদ্ধে বড়োসড়ো রকমের দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপিকে কী করে ফায়দা দিতে পারে? এটা অবশ্যই ঠিক যে, যে সমস্ত রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-র সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সরাসরি লড়াই আছে, সেখানে বিজেপি একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। কারণ ইউপিএ দুই সরকারের নীতির ফলে যে দুর্বিষহ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাতে মানুষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিতেই পারেন এবং যেহেতু এই সব রাজ্যে অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য বিকল্প নেই, তাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ একটু বাড়তি সুবিধা পেতেই পারে। এতে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর তথাকথিত ক্যারিশমা কতটা সাহায্য করছে, আর মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত কংগ্রেসের দুর্বলতা কতটা কাজ করছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পাঞ্জাবে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ কিছু কম নয়। উল্টো দিকে আসামে কংগ্রেসের সরকার জনগণের আস্থা তেমন ভাবে হারায়নি। এই দুটো রাজ্যেও বেশির ভাগ বুথফেরৎ সমীক্ষাগুলো বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের থেকে বেশি আসন দিয়েছে। যাঁরা বাস্তব রাজনীতির খবরাখবর রাখেন, তাঁরা এতে হয়তো একটু অবাকই হবেন। বিজেপি রাজনৈতিক মেরুকরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু, এই রকম রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রচেষ্টাতে বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলোর ভোটও বৃদ্ধি হতে পারে। তার কারণ, বিভিন্ন আসনে বিজেপি-র বিরুদ্ধে সব থেকে মজবুত ধর্মনিরপেক্ষ দল অনেক সময় কৌশলগত ভোটের কারণে লাভবান হতে পারে। অর্থাৎ, উত্তরপ্রদেশে কোনও একটি আসনে বিজেপি-বিরোধী ভোটের একটি বড়ো অংশ যদি বহুজন সমাজ পার্টির পক্ষে যায়, তা হলে অন্য আর একটি আসনে তা সমাজবাদী পার্টির পক্ষেও যেতে পারে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে ভারতের কেবল মাত্র মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুরাই বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেন না। বরং একটি বড়ো মাপের উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ সংখ্যাগুরু সমাজের মধ্যে আজও বিদ্যমান যাঁরা বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চান না।

রাজ্য কোন দিকে?

পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই কংগ্রেস ও বামেদের একটি অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আসতে শুরু করে। বিজেপির যদি কিছু ভোট এই রাজ্যে বাড়েও, তা হলে এই নব্য তৃণমূলীরা তৃণমূল কংগ্রেসকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হতে সাহায্য করবে। উল্টো দিকে মোদী ও বিজেপির হাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে সংখ্যালঘু মানুষের একটি বড়ো অংশ তৃণমূলের পিছনে দাঁড়াতে পারে। এই ভোটে বামেদের সব থেকে বড়ো সমস্যা হল তাদের অবিরত সাংগঠনিক ক্ষয় এবং তৃণমূল ও বামেদের মধ্যে মূল নির্বাচনী ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে পার্থক্যের অভাব (অ-কংগ্রেস অ-বিজেপি সরকার গঠন, খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগ, পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি)। তা হলে মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বামেদের কেন ভোট দেবে? এস ই জেড ও জমিনীতির ক্ষেত্রে তৃণমূল বরং বামদের থেকে সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তৃণমূলের সব থেকে বড়ো দুর্বলতা হল দুর্নীতি, চাষিদের আত্মহত্যা ও নারী নির্যাতনের ইস্যু। এই সব ইস্যুগুলোতে গত তিন বছরে বিরোধীরা প্রায় নিদ্রামগ্ন অবস্থায় থাকার ফলে কোনও বড়ো রকমের সরকার বিরোধী আন্দোলন হয়নি। ভেবে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন তখন বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি কী ভবে লড়াই চালিয়েছিলেন। তার ফলও তিনি পেয়েছিলেন। শেষে মাস্টারমশাই হিসেবে বলতে পারি সারা বছর পড়াশোনা না করে কেবল শেষ লগ্নে স্টেজে মেরে ভালো নম্বর পাওয়া যায় না। (রাজনৈতিক) শিক্ষার এই মূল মন্ত্রটিকে অনুধাবন করতে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীরা ব্যর্থ।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক